মানবাধিকার সনদের ঘোষণাপত্রের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে পঃ বঃ মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিফিউজি স্টাডিজের সহযোগিতায় আয়োজিত 'রাষ্ট্র, সমাজ ও মানবাধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম বিষয় হিসাবে মানবাধিকারের একটি সুপ্রাচীন এবং বর্ণময় ইতিহাস আছে। 'ইংলিশ বিল অব্ রাইটস্', 'ফ্রেঞ্চ ডিক্লারেশন অব্ দ্য রাইট্স্', 'অ্যামেরিকান ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেণ্ডন্স' সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম বলেছেন সমস্ত প্রাণীকূলে মানুষই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। অন্য প্রাণীর হাত থেকে বাঁচার বিশেষ কোন কৌশল তার আয়ত্তে নেই। তবে মানুষ যৌথ জীবন যাপন ও শিকার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার কিয়দংশের সমাধান করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সমাজ ও মানুষ হয়েছে সামাজিক জীব। কিন্তু তখন বৃহত্তর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। মানুষই আবার আরো শক্তিধর ও ক্ষমতাশীল মানুষের আক্রমণ থেকে বাঁচার রাস্তা খুঁজেছে। সুতরাং মানুষের সমস্ত ইতিহাসের মূলকথা হল সুরক্ষা। প্রথমে মনুষ্যেতর প্রাণীর থেকে, পরে সমাজ সৃষ্টি হল 'নিজের' থেকে সুরক্ষা। সংখ্যালঘুর প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠের থেকে সুরক্ষা, নারীর পুরুষের থেকে, কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির শ্বেতাঙ্গের থেকে এবং দুর্বল ব্যক্তির শক্তিমানের থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন। মানবাধিকার হল একজন মানুষের আক্রমণের বিরুদ্ধে অন্য মানুষের লড়াইয়ের নৈতিক হাতিয়ার। এই মানবাধিকার বা হিউম্যান রাইট্সকে একসময় 'স্বাভাবিক অধিকার' বা ন্যাচারাল রাইট্স হিসাবে গণ্য করা হত। 'ল অব নেচার' বা প্রকৃতির বিধিতে সব মানুষের ক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হয় এবং মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন স্বীকার করা হয়। স্বাধীনতা ও সাম্য হল প্রকৃতি মাতার মনের অকথিত নির্দেশ। এই স্বাভাবিক আইনের বলে সৃষ্ট অধিকার মানুষকে সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকার দিয়েছে এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য চাই একটি গভর্ণমেন্ট বা সরকার। তার প্রধান কর্তব্য হবে জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই কারণেই মানুষ সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ ।

সমাজ ও মানবাধিকারের সম্পর্ক আলোচনার পর এসে পড়ে রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তির ক্ষমতা এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা হিসেবে মানবাধিকারের সৃষ্টি। যদি মধ্যযুগ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানবাধিকারের ইতিহাস পর্যালোচনা করি দেখতে পাব মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম হল প্রকৃতপক্ষে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়া সুনিশ্চিত করার অভিযান। ১২১৫ সনের ম্যাগনা কার্টা, ১৬৮৮ সালের বিদ্রোহের গৌরবময় অধ্যায় এবং ১৭৭৬ সালের আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত । পাশ্চাত্যের দেশসমূহ—যাদের মানবাধিকারের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে বলে দাবী করে তারাই আবার তাদের উপনিবেশগুলির মানবাধিকার অস্বীকার করে। যখন এই সমস্ত উপনিবেশ নিজেদের স্বাধীনতা দাবী করে তখনই তাদের নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান অবধি অধিকাংশ দেশে মানবাধিকারকে 'বুর্জোয়াদের অধিকার' বলা হত। কারণ তা কেবল শাসক ও তাদের ঔপনিবেশিক মিত্রদের কুক্ষিগত ছিল। তৃতীয় বিশ্বের উন্মোচনের সাথে সাথে সদ্য স্বাধীন দেশগুলি আর্থ সামাজিক অধিকারের থেকে মানবাধিকারকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে।

মানবাধিকার সম্পর্কে মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা দেখা প্রয়োজন। মানবাধিকারের মার্কসীয় ধারণা হল এটি 'বুর্জোয়াদের অধিকার' বা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর হস্তগত অধিকার যা সর্বহারাদের নাগালের বাইরে থাকে । একমাত্র সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এবং শ্রেণীর বিলোপ হলে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। মার্কসবাদের সমালোচনার তীর বরাবরই পুঁজিপতিদের গণতন্ত্রের প্রতি। লেনিনের মতে এই গণতন্ত্র সংকীর্ণ, গরিবদের প্রতি বঞ্চনাপূর্ণ ও নিরতিশয় ভণ্ডামিতে ভরা। পুঁজিবাদে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে তা সংখ্যালঘুদের নিপীড়নের অস্ত্র। সুতরাং সংখ্যালঘুরা রক্তপাত ও হিংসার মাধ্যমে শোষকদের পাল্টা নির্যাতন করবে বলাই বাহুল্য। কিন্তু এরমধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে। একনায়কতন্ত্রে শুধু মানবাধিকারই নয় কোন অধিকারই সুনিশ্চিত নয়। পূর্বতন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র বা যুগোশ্লাভিয়া ছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব। কোনরূপ প্ররোচনামূলক লেখা বা বক্তৃতার জন্য কারাবাস অবশ্যম্ভাবী ছিল। কম্যুনিষ্ট দেশে মানবাধিকারের তাত্ত্বিক ওবাস্তব প্রয়োগের আকাশপাতাল ফারাক। একনায়কতন্ত্রের এই নির্মম ছবি সত্যিই ভয়প্রদ। জনগণ যারা কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল বিপ্লবের সুফল তারা পায়নি, তা গেছে আমলাতন্ত্রের হাতে। তবে মানবাধিকার নিয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের এই বিরূপতা সত্ত্বেও এর মুখ্য অবদান হল 'কাজ করার অধিকার', 'সম্পদের যথাযথ বন্টন' ও 'অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার' ভিত্তিতে মানবাধিকারের মতবাদ। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকলেও মার্কসবাদ কিছু বিষয়ে পথিকৃত । যেমন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, নারীর অধিকার, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমকাজে সমবেতন ইত্যাদি।

তৃতীয় বিশ্বের মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভারত ও চীনের প্রেক্ষাপট দেখা জরুরী। কারণ সারাবিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এই দুই দেশে বাস করে। পশ্চিমী দেশগুলি চীনকে মানবাধিকারের প্রশ্নে 'দুর্বল রাষ্ট্র' আখ্যা দিতে পিছপা নয়। মানবাধিকার যেহেতু পাশ্চাত্যের সৃষ্ট ধারণা, প্রাচ্যের উপর এর বিশেষ প্রভাব নেই। কম্যুনিষ্ট এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর মাও-সে-তুঙ চীনকে কড়া হাতে শাসন করে গেছেন। দেং-জিয়াও-পিঙ-এর কালে সারা পৃথিবীর সাথে চীনের যোগাযোগ শুরু হয়। ঘটে যায় তিয়েনআনমেন স্কোয়ার-এর ঘটনা যেখানে চীনের মানুষ আরো স্বায়ত্বশাসন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য দাবী তুলেছিল। সরকার আন্দোলন-কারীদের উপর নির্মম হয়ে ওঠে। বহু লোক মারা যায়, বহু কারারুদ্ধ হয় চিরজীবনের জন্য। সারা বিশ্ব চীনের মানুষের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের এই ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দেং-জিয়াও-পিঙ সব অভিযোগ অস্বীকার করে জানান মানবাধিকার জাতীয় পাশ্চাত্যের মূল্যবোধকে চৈনিক সমাজ প্রশ্রয় দেয় না। তারা কনফিউশিয়ানিসম-এ বিশ্বাসী।

ভারতবর্ষের দিকে তাকান যাক । সংবিধানে নিহিত সকল মুখ্য মানবাধিকার নিয়ে ভারত হল পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তবে পূর্বে রাজা ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কেবল অধিকার ভোগ করত। বৈশ্য ও শূদ্রেরা ছিল অপাংক্তেয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সনদের খসড়া রচনায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমাদের দেশে মানবাধিকার সম্বন্ধে সামাজিক সচেতনতার অভাব হল আসল সমস্যা। নারীর অধিকার এবং শিশুর কল্যাণ আজও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সংবিধানে প্রদত্ত সুযোগসুবিধা মানুষ সচেতনতার অভাবে গ্রহণ করে উঠতে পারেনি। যেমন, ১৯৮৪ সনের ডাউরি প্রহিবিশন (অ্যামেণ্ডমেন্ট) অ্যাক্ট-এ ভুক্তভোগীদের জন্য আইনগত প্রতিকার আছে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা অজ্ঞাত। ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি । ভারতবর্ষে যদিও ৪০ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ চার্জশীট দেয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেরীতে রিপোর্ট করা, বিপরীত ডাক্তারি অভিমত, সাক্ষীর অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে অপরাধী খালাস পেয়ে যায়। উপরন্তু, ভারতীয় পুলিশ ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের দ্বারা আজও চালিত। সঠিক ভাবে চার্জশীট না দেওয়ায় অপরাধী সহজে জামিন পায়। ম্যাজিস্ট্রেটের অসহায়তা প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকা বন্দীদের অবস্থা আরো করুণ। ১৯৯৩ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ বন্দী বিচারের অপেক্ষায় জেলে পচছে। 'বিলম্বিত বিচার মানেই বিচারকে অগ্রাহ্য করা'—উক্তিটি যথার্থ।

শিশু শ্রমিকদের বিষয়ে বলা যায়, যোজনা কমিশন হিসাব করে দেখেছে ২০০০ সালের শেষে প্রায় দুইকোটি শিশু শ্রমিক সৃষ্টি হবে।

নারীর অধিকার এখনও ভারতে বেশীরভাগ নারীর কাছ কাল্পনিক বস্তু। শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা এবং পণের জন্য মৃত্যু এমন ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, নারীর অধিকার একটা প্রহসন ব্যতীত কিছু নয়। হিন্দু এবং ইসলাম উভয় মতে সমগ্র নারী সমাজকে পর্দার আড়ালে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। (কিরণ বেদী, মায়বতী বা সুষমা স্বরাজ হল কিছু ব্যতিক্রম) যার ফলে বেশীর ভাগের নয়নার (তন্দুর হত্যা) মত গতি হয়েছে। ভারতীয় সমাজ নানা ধর্ম, জাত, শ্রেণীর ভিত্তিতে বহুধা বিভক্ত। তদুপরি সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই একধরনের বিতৃষ্ণা আছে।

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পাতার প্রথম কলমে)